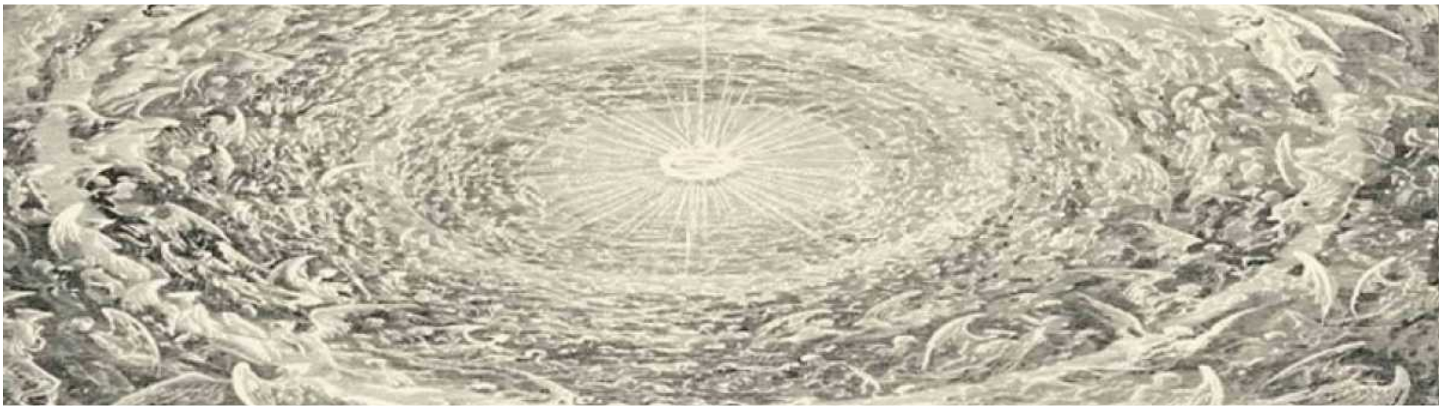

মানবতার উৎকর্ষ সাধনে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভূমিকা

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

আবু জাফর

বিষয়টি আলোচনার জন্য দৃশ্যত সহজ হলেও, আসলে সহজ নয়। কারণ একদিকে ‘মানবতা’ নামক এই বহুল-ব্যবহৃত কথাটিকে সর্বজনগ্রাহ্যরূপে সজ্ঞায়িত (define) করা যেমন দুরূহ; অপরদিকে ‘সাহিত্য-সংস্কৃতির’ মতো বহুবর্ণিল ও বহুভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য একটি সদা-পরিবর্তনশীল বিষয়ের সঙ্গে মানবতাকে মিলিয়ে দেখা আরো অধিক দুরূহ। তবু যেভাবেই দেখা হোক, যেহেতু আধুনিক বিশ্বে মানবতা আজ নিদারুণভাবে ভুলুণ্ঠিত; এবং যেহেতু একই সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি আজ এই আধুনিক বিশ্বের একটি প্রবল আধিপত্যবিস্তারী অবিচ্ছেদ্য অংশ, মানবতার উৎকর্ষ সাধনে সাহিত্য সংস্কৃতির ভূমিকা কী অথবা কোনো ভূমিকা আদৌ আছে কিনা, থাকলে তা কতখানি ও কী ধরনের, এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা বর্তমান সময়ের একটি অপরিহার্য দাবি।

আলোচনার সুবিধার্থে ‘মানবতা’ বলতে আমরা মোটামুটি কী বুঝি, সে বিষয়টি কিঞ্চিৎ স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। মানুষ জন্মগতভাবেই একদিকে যেমন প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী দ্বিপদ জন্তুবিশেষ; আবার অন্যদিকে একই সঙ্গে ঐশী-প্রেরণা দ্বারা সমৃদ্ধ অনেক গুণ, অনেক মূল্য ও মহিমাও অন্তর্জগতকে আলোকিত করে রেখেছে। বলাই, এই আলো এবং অন্ধকার, প্রবৃত্তিতাড়িত জান্তবতা এবং মহত্তম চৈতন্য, এই বিপরীতমুখী দ্বিমাত্রিকতার মধ্যেই মানবজীবনের অস্তিত্ব ও আবর্তন। যারা পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ না-করে আল্লাহ পাকের বিধান অনুযায়ী বৈধ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী; যারা স্বভাবের কুৎসিত চাহিদাগুলোকে পরাভূত করে জীবনের ক্ষেত্রে মহত্তম গুণাবলীকে বিজয়ী করে তুলেছে, আল্লাহ পাকের ভাষায় তারাই হলো ‘আহসানি তাকবীম’ উৎকৃষ্টতম অবয়বে উৎকৃষ্টতম মানুষ। আর যারা ইতর প্রবৃত্তির ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে, তারা ‘আসফালা সাফিলীন’ নিকৃষ্টতম অপেক্ষাও হীন ও নিকৃষ্ট। অতএব মানবতা বা ইনসানিয়াত মানে মনুষ্যত্বের যথাযথ বিকাশ ও জাগরণ; মানবিক গুণাবিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়ে মানব চৈতন্যের উর্ধমুখী অভিযাত্রা, উর্ধমুখী অবস্থান। বাহ্যিকভাবে দৃশ্যত মানবতার এই রূপ ও স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি তাদের মধ্যে, যারা ঈর্ষা অসূয়া ও মানববিদ্বেষকে পরিহার করে সর্বমানবিক দায়িত্ববোধ, সকল কুশ্রীতা ও অশ্লীলতার স্থলে শাশ্বত সৌন্দর্যচেতনা, যে কোনো ধরনের অন্ধত্ব ও স্বার্থপরতাকে বর্জন করে ইনসাফ-ঋদ্ধ মানব কল্যাণকে জীবনের আদর্শ করে তোলে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের মানুষ যে-দেশে ও সমাজে সংখ্যায় অধিক হয়ে ওঠে এবং নেতৃত্বে সমাসীন হয়, সেই দেশ ও সমাজই মানবতা-সমৃদ্ধ নিরাপদ সমাজ। অতএব দেশ ও সমাজ ও বিশ্বের কল্যাণ ও নিরাপত্তার প্রশ্নে মানবতার বিজয় একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। কারণ প্রবৃত্তির ক্রিতদাসরূপী অমানুষদের দ্বারা পরিচালিত পৃথিবী কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা ও ইনসাফের পৃথিবী হতে পারে না।

এখন আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। আমরা যে- মানবতার কথা সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করেছি, সেই মানবতা প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য-সংস্কৃতি কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে অথবা আদৌ পারে কিনা, সেটাই আমাদের বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সাহিত্য সংস্কৃতি একান্ত নিজের মতো করে গড়ে ওঠে না, উঠতেও পারে না; গড়ে ওঠে কোনো-না কোনো ধর্ম বা মতবাদ বা জীবনদর্শনের আশ্রয় ও অবলম্বন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি, ভারতীয় সংস্কৃতির যে-রূপ, তার প্রধান ভিত্তি হলো অংশীবাদ, পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতিপূজা এবং তৎসঙ্গে অবতারবাদনির্ভর মানবপূজা। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সাহিত্য গড়ে উঠেছে মার্কসীয় দর্শনপুষ্ট সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে। এবং ইউরোপীয় কি মার্কিনী সংস্কৃতি আসলে ধনতান্ত্রিক বস্তুবাদি জীবনদর্শনেরই অভিব্যক্তি। এবং আমরা এই কথাও জানি, একদা এই বাংলাদেশে বৌদ্ধ সিদ্ধচার্যরা যে চর্যাপদ রচনা করেছিলেন, তারও মূল অবলম্বন ছিল বৌদ্ধ ধর্মদর্শন। এবং পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব পদাবলী বা বাউল গানের যে

প্রসার ঘটে, সে সবও ছিলো যথাক্রমে বৈষ্ণব ও বাউল ধর্মাশ্রীত। উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব গীতিকবিতা রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক অনেকটা মানবিক বটে কিন্তু তার মধ্য দিয়ে মুখ্যত একটা ঐশ্বরিক আবেদন সৃষ্টির প্রেরণা ছিলো। এবং একইভাবে বহু-প্রচলিত বাউল গান হলো যৌনতাশ্রয়ী দেহবাদ-নির্ভর একটা ‘ আধ্যাত্মিক’ উপধর্ম। দৃষ্টান্ত আরো বাড়ানো যায় কিন্তু তার খুব একটা আবশ্যকতা নেই।

> আমরা শুধু এ প্রসঙ্গে এইটুকু বলতে চাই যে, যে কোন সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে কোনো-না কোনো ধর্ম ও জীবনধর্ম, বিশ্বাস ও মতবাদ। এমনকি সাহিত্য বা সংস্কৃতি যখন একেবারেই বিমূর্ত (Abstract), তখনো সে জ্ঞাত ও কি অজ্ঞাতসারে জড়িয়ে পড়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ও নান্দনিকতার আচ্ছাদনে এক প্রকার কুহক ও বিভ্রান্তিকর মতবাদের সঙ্গে। অর্থাৎ সাহিত্য সংস্কৃতি এমন হতেই পারে না, যেখানে কোনো-না কোনো ধর্ম ও বিশ্বাসের নিস্বন শুনতে পাওয়া যায় না।

এমতাবস্থায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনুষত্বের উৎকর্ষ সাধনে কতটা-কী ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে ও করে, সে-বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত আসতে হলে আল কোরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের নির্ভুল পথনির্দেশ ছাড়া আমাদের জন্য দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আল্লাহ পাক বলেন, ‘ ইন্নাদ্বীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম’ তাঁর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা ধর্ম হলো ইসলাম। (সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত-১৯) অর্থাৎ ইসলামের বাইরে অন্য যে সকল ধর্ম, তার কোনোটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এই সকল প্রত্যাখ্যাত ধর্ম ও মতবাদকে আশ্রয় করে যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, নিশ্চয়ই তারও কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর এই অগ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি বা সাহিত্য যে মানবকল্যাণের প্রশ্নে আদৌ কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়, বরং মানবতার অপকর্ষ সাধনই তার লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, এটা অস্বীকার করার কোনো হেতু নেই, কোনো যুক্তিও নেই। এই কথায় অনেকে বিস্মিত হতে পারেন, উদার ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা কষ্ট পেতে পারেন, কিন্তু এটাই সত্য ও নির্ভুল বাস্তবতা। সন্দেহ নেই, সাহিত্য সংস্কৃতির রমরমা প্রসার দেখে আমরাও বিভ্রান্ত হতে পারি, কিন্তু সত্য যে, হোমার কি শেক্সপিয়র হোক, প্রাক ইসলামী যুগের ইমরুল কায়েস হোক, গোর্কি টলস্টয় মায়াকাভস্কি হোক, চণ্ডীদাস গোবীন্দদাস কি রবীন্দ্রনাথ, লালন ফকির যেই হোক, আল কোরআনের দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্তকে অবহেলা করে কোনো মুমেনের পক্ষে এইসব কবি ও কবিতার সমর্থনে মানবকল্যাণের আশা জাগিয়ে তোলার চিন্তা ও চেষ্টা করা শুধু অসম্ভব নয়, ঘোরতরভাবে নিষিদ্ধও বটে।

আসলে সাহিত্য সংস্কৃতির যে রূপ ও সর্বগ্রাসী ভূমিকা দেখে পৃথিবী খুবই মুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট, প্রকৃতপক্ষেই তার মধ্যে কল্যাণের গন্ধমাত্র নেই; বরং যা আছে তার সারাংশ হলো মানবতার অপমান ও মিথ্যাচার ও মুনাফেকি! এইজন্যই আল্লাহ পাক সূরা শুয়ারাতে পরিষ্কার ঘোষোণা করেছেন, ‘ নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। বলুন, আমি কি বলব শয়তান কাদের ওপ্র প্রভাব বিস্তার করে? তারা আসে অসৎ ও মিথ্যাবাদীর কাছে। এসে আজগুবি মিথ্যা সরবরাহ করে এবং তারা অধিকাংশই ডাহা মিথ্যাবাদী।’

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলাম কি তাহলে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে? ইসলামে কাব্য-কবিতার স্থান কি একেবারেই নেই? আছে কি নেই, সিদ্ধ কি নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে একটু পরেই আমরা আমাদের আলোচনা পেশ করবো; তবে তার আগে একটা জরুরি কথা পরিষ্কার করে নিতে চাই। বস্তুতপক্ষেই মানবতা একটি অত্যন্ত বড় জিনিস। মানবতা হলো মানুষের ব্যক্তি ও সমাজের সর্বোচ্চ উত্তরণ, এবং মনুষ্যত্বের মহত্তম জাগরণ ও মহত্তম অভিব্যক্তি। দৃশ্যত আমরা যাকে সাহিত্য বলি, শিল্প-সংস্কৃতি বলি, সেই কবিতা নাটক গীতনৃত্য আমাদের আনন্দ কি বিনোদনের উপকরণ হতে পারে; কিন্তু মানুষকে তার আত্মিক ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করে তুলতে সক্ষম, এমন ধারণার মধ্যে আবেগ যাই থাক, যুক্তি ও বাস্তভতার কোনো স্থান নেই। বস্তুত, বিষয়টা এমন যে, বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিরাও তাদের সংস্কৃতি চিন্তা ও সাহিত্য দর্শনকে আপন চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম ও একমুখী রাখতে ব্যর্থ হন। অতএব স্বাভাবিকভাবেই একটি অনভিপ্রেত দ্বিমুখিতা চিরদিনের সাহিত্য সংস্কৃতির কমবেশি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির চিন্তা কর্ম ও অন্তর সৎ নয়, সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সৎ নয়। অর্থাৎ সততা কখনো আংশিক হয় না; সততা হলো মনপ্রাণ ও চিন্তা-কর্মের সার্বিক ও সর্বওমুখী পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য যে, তথাকথিত সাহিত্য-সংস্কৃতির মানবচরিত্রে এই সততা, এই অখণ্ডতা ও পরিচ্ছন্নতাকে দারুণভাবে বিপন্ন করে তোলে, যা থাকে এমন কি পৃথিবী-বিখ্যাত সৎ সংস্কৃতি সেবীরাও আত্মরক্ষা করতে পারেন না। বার্ট্রান্ড রাসেলকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, ‘ আপনি তো বিবাহ প্রাথার অনাবশ্যক অপকারিতা নিয়ে অনেক কথা লিখেছেন; অথচ আপনি নিজে একাধিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, এটা কেমন হলো?’ রাসেল সাহেবের সপ্রতিভ জবাব, ‘ একটি হলো আমার জীবন, অপরটি দর্শন।’ এরকম প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকেও করা যেতো। যদি কেউ বলতেন, ‘আপনি তো বিশ্বমানবতার কবি। দুই বিঘা জমি-তে দরিদ্র অসহায় উপেনের প্রতি আপনার কী

অপরিসীম দরদ ও সহমর্মিতা! কিন্তু শিলাইদহে দরিদ্র মুসলমান প্রজাদেরকে নিগ্রহ নিপীড়নের জন্য এই আপনিই নমঃশূদ্র লাঠিয়াল বাহিনী নিয়োগ করেছিলেন!' সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথও বার্ট্রান্ড রাসেলের মতোই জবাব দিতেন, 'এক জায়গায় আমি কবি, অন্য জায়গাটিতে আমি জমিদার।' মোক্ষম জবাব; কিন্তু এর মধ্যে যে একটি গুরুতর আত্মবিভক্তি বড় হয়ে উঠছে, তার তো কোনো জবাব নেই। আসলে রাসেল কি রবীন্দ্রনাথের দোষ নয়, তাঁদের চিন্তা ও চরিত্র এমন এক জীবনদর্শন দ্বারা লালিত অথবা আচ্ছাদিত, যা তাঁদের কথা ও কর্মকে অখণ্ড থাকতে দেয় না, গুরুতরভাবে দ্বিমুখী এবং দ্বিধাবিভক্ত হতে বাধ্য করে। অতএব এটা না-মেনে উপায় নেই যে, এই দ্বিমুখিতা চিরদিনের সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি দূরারোগ্য ব্যাধি ও বৈশিষ্ট। এই জন্যই আল্লাহ পাক বলেন, 'তাদের কথার সঙ্গে কাজের কোনো মিল নেই।' (সূরা শুয়ারা) এবং এইজন্য রাসূলও (সাঃ) বলেছেন, 'পানি যেরূপ শস্য উৎপাদন করে, গান বাজনা সেইরূপ কপটতা জন্মায়।' অতএব অশ্লীল কাব্যকবিতা গানবাজনা নৃত্যগীত ইত্যাদি নিয়ে আবহমান পৃথিবীর যে জমজমাট সাহিত্য-সংস্কৃতি, তার দ্বারা উৎকর্ষ তো দূরের কথা, মানবতার সীমাহীন ক্ষতি ও অপকর্ষই বরং সাধিত হয়েছে।

যাই হোক, আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যা বলতে চাই তাহলো, মানবতার উৎকর্ষ সাধন যদি আমাদের কাম্য হয়; আমরা যদি চাই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও মহত্তম মানবিক চেতনায় সমৃদ্ধ একটি সুস্থ ও সমাজ নিরাপদ পৃথিবী, তাহলে ইসলাম যা বলে সেইদিকে মনোনিবেশ করতে হবে। ইসলাম বলে, পূর্ণ ইনসানিয়াত হাসিলের মূল শর্ত হলো তাওহীদ, আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয় এবং রাসূল (সাঃ) এর জীবনাদর্শ। যে-সাহিত্য যে-সংস্কৃতি এই তিনটি শর্তকে মানব চরিত্রে ইতিবাচক প্রতিশ্রুতির আলো ছড়িয়ে দেয়, সেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি মানবতার উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ফররুখের কবিতা, ইকবালের কাব্যসমগ্র, নজরুলের অনেক কবিতা ও গান আমাদের তাওহিদী চেতনার পক্ষে অনুকূল ও উপকারী। বাস্তবিকপক্ষে কথার মতো কবিতারও ভালো-মন্দ আছে। এবং এই জন্যই রাসূল (সাঃ) কবিতা-রচনায় অনেক উৎসাহও দিয়েছেন। তাঁর অনেক সাহাবী (রাঃ) ছিলেন যাঁরা অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করেছেন; এমনকি আমাদের জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকাও (রাঃ) ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট কবি। কিন্তু সাহিত্য কি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যদি তাওহীদ ও আখেরাতকে বিস্মৃত হয়ে পৌত্তলিকতা ও অশ্লীলতা ও অর্থহীন হাস্যরসের সমর্থক হয়ে উঠে, যদি নাস্তিক ও খোদাদ্রোহী করে তোলে, করে তোলে কুৎসিত স্বার্থপরতার অন্ধ ক্রীতদাস, সেই সাহিত্য সেই সংস্কৃতি কখনো আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানবতার পাথেয় হতে পারে না। পৃথিবীর বড় বদনসীব, এই ধরনের সাহিত্য ও সংস্কৃতিই আজ বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করে আছে; যার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে শুধু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শয়তানের উল্লসিত কণ্ঠস্বর। আমরা চাই এমন সাহিত্য এবং এমন সংস্কৃতির সরব ও অপ্রতিহত বিস্তার, যা সকল ক্ষুদ্রতা ও কুশ্রীতাকে পরাভূত করে মানুষে মানুষে ভালোবাসায় সমৃদ্ধ এক নিরাপদ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাতে পারে, আল্লাহর ভয় দ্বারা পরিচালিত একটি সুস্থ ও সুষম সমাজ গঠনকে নিশ্চিত করে তোলে। এই ধরনের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে আমাদের তাওহিদী জীবনদর্শনের প্রকৃষ্ট রূপ যেমন বাঙময় হয়ে উঠে, একই সঙ্গে মানবিক মহত্বের পরাকাষ্ঠা নিয়ে শাশ্বত মানবতাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শির্ক ও অশ্লীলতাপুষ্ট তথাকথিত ললিতকলা, গীতবাদ্য ভাস্কর্য প্রকৃতিপূজা ইত্যাদি ধরনের ইবলিসী-নান্দনিকতা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন।

সূত্রঃ সংস্কৃতিঃ "জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০৪" স্মারক গ্রন্থ।

আবু জাফর